ইতিকথা, বর্ষ ১০, সংখ্যা ২, জুলাই ২০২২ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ০-০
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ: বাঙালি 'ভদ্রলোক'-এর উত্থান

জহর সরকার*

(প্রাপ্ত: ১২ আগস্ট ২০২১ খ্রি., গৃহীত: ৪ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

মূলত উত্তর ভারতের বর্ণ বা জাতব্যবস্থার সঙ্গে বাংলার হিন্দু সমাজের বর্ণ বা জাতব্যবস্থার বহুক্ষেত্রে মিল নেই। একথা অবশ্য অস্বীকারের নয় যে, বাংলায় হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থরা সমাজপতির স্থান দখল করে নেয়। মধ্যযুগের ইতিহাস পাঠ করলে এত কিছু পাওয়া যায় না। বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চালু হতে আলোচ্য তিন বর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক যাবতীয় সুবিধা ভোগ করতে শুরু করে দেয়। তারাই ঐতিহ্যগতভাবে বণিক গোষ্ঠীকে স্থানচ্যুত করে। লক্ষণীয় বিষয় যে, উত্তর ভারতের মতো বাংলায় ব্রাহ্মণরা কিন্তু অন্য দুই উচ্চবর্ণের মানুষকে নিজেদের থেকে পৃথক করেনি। যদিও মুসলমানকে বাঙালি বলতেই তারা রাজি ছিল না। উচ্চ দুই বর্ণের মানুষরা মধ্যযুগেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতকে পুষ্ট করে, যা উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া ছিল। কারণ হিসেবে, চৈতন্যর আন্দোলনকে দায়ী করা চলে। তবে ইংরেজদের শাসন শুরু হতে কলকাতার মতো স্থানে বৈশ্য সম্প্রদায়ের সদস্যরাই প্রথমে বাণিজ্যে প্রধান ভূমিকা নেয়। অবশ্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। ইংরেজদের বাণিজ্যে দেশি বেনিয়ান গোষ্ঠীর উত্থান হয়েছিল প্রধানত এইসব উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্য থেকেই। একইরকমভাবে জমিদারদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বর্ণের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। এই পরিস্থিতির কিছুটা উদ্ভব বাংলার নবাবি শাসনেই শুরু হয় এবং উচ্চবর্ণের জমিদার/আমলারা সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সঙ্গেও ওঠাবসা করত। অর্থাৎ এই গোষ্ঠীর সম্পদ সংগ্রহের ইতিহাস দীর্ঘ। অবশ্য এরাই দেশকে স্বাধীন করতে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকারও করেছে।

---

* অধিকর্তা (অব.), প্রসারভারতী ও বর্তমানে সাংসদ।
e-mail: sircar.j@gmail.com

সূচকশব্দ

১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ, ভদ্রলোক, বর্ণ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কোম্পানি, বেনিয়ান, গোমস্তা।

শুরুতেই বলি ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাবলি বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক গোষ্ঠীর উত্থানের ইঙ্গিত করে, যাকে পরবর্তীকালে বাংলার 'ভদ্রলোক' শ্রেণি বলে অভিহিত করা হবে। আলোকিত ঊনবিংশ শতাব্দীতে একবার এসে পড়লে আমরা বহু তথ্য পাই এবং এই ভদ্রলোকদের ওপরেও আলোকপাত করা যায় অথবা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ঘটিত পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের নথিপত্র ঘাঁটলেও কিছু হদিশ পাওয়া যাবে। পলাশির যুদ্ধের ঠিক পূর্বের অন্ধকার সময়ের দিকে তাকানোটাকে আমরা এড়িয়ে চলি, যেখানে সামাজিক গোষ্ঠী বা বর্ণসমূহের আচরণ বিষয়ক বিশেষ কোনো তথ্য নেই। কিন্তু নির্ভরযোগ্য উপাদান ছাড়া কোনো অর্থবহ সামাজিক ইতিহাস রচনা করা কঠিন। অবশ্যই আমাদের আগ্রহ কেবল এই 'ভদ্রলোক' পরিচয়টির উদ্ভবের ব্যাপরেই অধিক এবং আমরা ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক এবং বিনিয়োগ নীতির বদল নিয়ে চর্চা করব এবং সেটি অবশ্যই করা হবে সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির কেরানি সহায়ক নামক এক নতুন শ্রেণি, যাদের বলা হত 'গোমস্তা', তাদের সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ করার জন্য তাদের পুরাতন সহযোগী বণিক বা ব্যবসায়ী শ্রেণির উৎখাতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি অতীতে বহুবার আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আলোচনা করেছেন অর্থনৈতিক ইতিহাস রচয়িতারা বা রাজনৈতিক বক্তারা, সামাজিক ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্যে তা করা হয়নি। আধুনিক ভারতের ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা সেগুলির সঙ্গে হয়তো পরিচিত, কিন্তু আমরা এখনও এমন কোনো রচনার মুখোমুখি হইনি, যেটি এই 'ভদ্রলোক' শ্রেণি, যার মধ্যে নিহিত ছিল বঙ্গদেশের তিনটি উচ্চবর্ণ—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ, তাদের ক্ষমতায়নের ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

আমরা মেনে নিচ্ছি যে, এই জাতিগত দৃষ্টিকোণ একটি নতুন দিক, কারণ অর্থনৈতিক ইতিহাস রচয়িতারা এতদিন বাণিজ্যের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতেই মনোযোগী ছিলেন। তাঁরা হয়তো লক্ষ্যও করেননি যে, ওই নথিপত্রগুলিও বাংলার তথাকথিত উচ্চবর্ণগুলির অনন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ জোট সম্বন্ধীয় প্রথম লিখিত নথি। তাদের একত্রিত হওয়া এবং পরস্পরকে সমর্থন করা, কখনোই লিখিত আকারে ভদ্রলোক জোটের 'আগমনবার্তা' হিসেবে ঐতিহাসিকদের দ্বারা চিহ্নিত হয়নি। অবশ্য ১৭৫৩-তে পুরোনো ফোর্ট উইলিয়মের নাটকে ছোট-বড় সমস্ত অভিনেতাদের নাম (এবং বর্ণ) ঐতিহাসিকদের এবং গবেষকদের দিকে কয়েক পুরুষ ধরেই চেয়ে আছে। ফোর্ট

উইলিয়মের চিঠিচাপাটি, 'দেশীয় বিবিধ' এবং 'দেশীয় পাবলিক' ফাইলদ্বয় এবং বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশনগুলি নিতান্ত গতানুগতিকভাবে পড়ে যাওয়া হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় ব্রিটিশদের কাজকর্ম সংক্রান্ত তথ্যাদি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস দপ্তরে, নতুন দিল্লির জাতীয় মহাফেজখানায় (এনএআই) এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানায় ঐতিহাসিকেরা দশকের পর দশক ধরে পরীক্ষা করে এসেছেন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস বোঝার জন্য ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাগুলিও বারবার পরীক্ষা করেছেন।

সামাজিক ইতিহাস রচয়িতাদের মতে, এই একত্রিত হওয়ার কাজটির উদ্দেশ্য তিনটি বর্ণের পারস্পরিক স্বার্থেই, তাই তারা নিজেদের জোটবদ্ধ অস্তিত্ব (যাদের পরে 'ভদ্রলোক' অভিধা দেওয়া হবে) সম্বন্ধে সচেতন ছিল এবং শাস্ত্রীয় আচারগুলির বাধা অতিক্রম করে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষমতাও রাখত। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জাতিভিত্তিক জনগণনা থেকে জানা যায় যে, জাতিগুলির এই ত্রিদলীয় জোট বাংলার জনসংখ্যার মাত্র ৬.৪ শতাংশ ছিল। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ এই নবজাত ভদ্রলোক শ্রেণির দীর্ঘ যাত্রার সূচনাপর্ব বলা যেতে পারে, যারা পরবর্তীকালে তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব নিশ্চিত করে এবং যা বর্তমানেও কমবেশি বজায় রয়েছে। জাতিগুলি তাদের এই জোটকে কাজে লাগিয়ে তখনকার দিনের ইংরেজি এবং অন্যান্য লাভজনক শিক্ষার এবং সরকারি ও অন্যান্য সম্মানজনক চাকুরির সুযোগকে পুরোদস্তুর ব্যবহার করে সামাজিক আধিপত্য বিস্তারের চরম সীমা অবধি যেতে পারত। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে কিন্তু চিত্রটা ভিন্ন, যেখানে ক্রমাগত জাতপাতের যুদ্ধ ঘটতে দেখা গেছে এবং এখনও দেখা যায়। আসল কথা হল, এই পারস্পরিক সম্বন্ধ কেবলমাত্র এই তিনটি বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাটাও ইঙ্গিত করে যে, অলিখিত এই সামাজিক চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য জাত এবং সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে এই ত্রিবর্ণের জোট দ্বারা দখলীকৃত নানা সুযোগসুবিধা থেকে দূরে রাখা, যেগুলি তারাই একচ্ছত্রভাবে ভোগ করছিল।

এটি কিন্তু বাংলার ঐতিহ্যবাহী বণিকশ্রেণির বিরুদ্ধে ছিল না, যাদের নাম অন্তত একশো বছর ধরে বা তারপরেও ধনসম্পদের সমার্থক বলে বিবেচিত হত। এটি একদিক থেকে দেখলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভদ্রলোক এবং ভদ্রলোকদের মতো মানুষদের (১৮২১ খ্রিস্টাব্দের আগে 'ভদ্রলোক' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়নি) সঙ্গে তাদের প্রভুদের, যারা মূলত ইংরেজ কোম্পানির মুখপাত্র ছিল, তাদের একরকম আঁতাত। অবশ্যই এই আঁতাত দু-পক্ষের জন্যেই লাভজনক বলে বিবেচিত হয়েছে। এই জোটের ফলে ব্যবসা এবং লাভ যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছিল। একইভাবে কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের কাছেও সেই অবস্থা যথেষ্ট সহায়ক হয়, কারণ চাকুরির পাশে পাশে তাদের

নিজস্ব ব্যবসাগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে ফুলেফেঁপে উঠেছিল মূলত এই ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাদের নিযুক্ত গোমস্তাদের সহায়তায়। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ জোট সাফল্যের যে স্তরে পৌঁছোয় তাও অভাবিত, অবশ্যই এই বিবেকবর্জিত আঁতাতের কল্যাণেই। ইংরেজরা বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলিম শাসকদের পলাশির প্রান্তরে পরাজিত করে। এই যুদ্ধের পর ইংরেজদের প্রতি পদক্ষেপ অগ্রসর হওয়ার ফলে যাতে দু-পক্ষই লাভবান হয় সেটি বিজয়ী জোট নিশ্চিত করে প্রায় এক শতক বা তার বেশি সময় ধরে। এখানে একটু থামা যেতে পারে, যেহেতু 'ভদ্রলোক' শব্দটি প্রায়শই এবং বারবারই ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু ভদ্রলোক শ্রেণির জাতিগত গঠনটি কেউই কখনও দায়িত্ব নিয়ে প্রামাণিক ভিত্তিতে স্থিরীকৃত করেনি।

আমরা শীঘ্রই কিছু বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকের কথা উল্লেখ করব, মূলত যাঁরা ছিলেন বিদেশি। তাঁরা তৎকালীন বাংলার সামাজিক পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই তিনটি উচ্চবর্ণের সঙ্গে 'ভদ্রলোক' শব্দটিকে একাত্ম করে দেখতে ইতস্তত করেননি— যা আমরাও এই নিবন্ধে করব। যদিও এটি ভুললে চলবে না যে, বাংলার অন্যান্য কিছু জাত এবং সামাজিক গোষ্ঠীর অবস্থানও এই 'ভদ্রলোক' শ্রেণির আবছা বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। তথাপি খুব একটা বোধহয় ভুল হবে না, যদি আমরা 'ভদ্রলোক' বলতে প্রধানত বাংলার শিক্ষিত ও সংস্কৃতিপ্রিয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের বোঝাই। এ প্রসঙ্গে আমাদের যুক্তিগুলি হচ্ছে—

(ক) ভদ্রলোক বললেই জনচিত্ত জুড়ে থাকা জনপ্রিয় কল্পনায় এই তিনটি জাতের চিত্র ফুটে ওঠে। আমরা মূলত তাদের 'পরিচয়' নিয়ে আলোচনা করছি, যা নিশ্চিতভাবেই কোনো এক ধারণা থেকে উদ্ভূত।

(খ) বাংলায় আর কোনো উপযুক্ত শব্দ নেই, যা এই তিন বর্ণের জোটকে আরও ভালোভাবে বর্ণনা করতে পারে কারণ পশ্চিমবঙ্গে জাতপাতের গঠন নিয়ে আলোচনা করা যথেষ্ট কঠিন।

(গ) বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য জাত বা শিক্ষিত নিম্নবর্ণের মানুষদেরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভদ্রলোক অভিজাত সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীভুক্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে। তথাপি বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও ভদ্রলোক বলতে বুঝতে হবে শুধু ওই তিনটি উচ্চবর্ণের শিক্ষিত অংশটিকে।

এখানে একটু সতর্কীকরণ প্রয়োজন এবং তা হল যে, এই 'ভদ্রলোক' শব্দটি যথাযোগ্যভাবে ওই তিন বর্ণের শিক্ষিত অংশটিকেই বোঝালেও এর অর্থ এই নয় যে আর সবাই 'অভদ্র' বা ভদ্রলোকের শ্রেণিতে পড়েই না। আমরা শব্দটা মূলত ওই তিনটি বর্ণ, যারা ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে এক অলিখিত চুক্তিমতো একত্রিত হয়ে জোট তৈরি করেছিল

তাদেরকে বর্ণনা করতে ব্যবহার করছি—যা এই নিবন্ধের মূল বক্তব্য করছি আর কোনো চটজলদি প্রতিশব্দ পাচ্ছি না বলেই। উদাহরণস্বরূপ একটি ছোট অথচ অকথিত সত্যের উল্লেখ করা যায় যে, স্বাধীনতার পরবর্তী মোট ৭২ বছরে রাজ্যে এই তিন বর্ণ ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হননি। পণ্ডিতেরা যদিও এখনও বাংলার বর্ণগত শ্রেণিবিভাগকে নিয়ে চরম কোনো রায় দেওয়ার ব্যাপারে সংযতবাক হয়েই আছেন, কিন্তু আমরা আবারও বলব যে, 'বণিক সম্প্রদায়' বললে স্বাভাবিকভাবে যেমন তা সমস্ত ব্যবসায়ী এবং বণিক শ্রেণিকেই বোঝায়, তেমনি 'ভদ্রলোক' শব্দটিও একইভাবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ এই তিনটি শ্রেণিকেই বোঝায়; অথবা অন্তত এই তিন শ্রেণির শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিমনস্ক স্তরটিকে বোঝায়। জে এইচ ব্রুমফিল্ড এই তিনটি শ্রেণিকে বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটেও 'ভদ্রলোক' বলে বর্ণনা করতে কোনো দ্বিধাবোধ করেনি। তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেছেন যে, ভদ্রলোক শব্দটি ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে অনবরত উচ্চারিত হয়েছে উচ্চবর্ণের প্রতিশব্দ হিসেবে, আর উনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ বলেই তাদের উল্লেখ করেছেন।[১]

এস এন মুখার্জী ভদ্রলোক শ্রেণির আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন এবং বলেছেন, মনে হয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ এই তিন বর্ণ মিলিতভাবে সনাতন সমাজের কাঠামো এবং বাংলার শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেই একটি আধা-অভিজাত শ্রেণি গড়ে তুলেছে। পাল, সেন, পাঠান এবং মুঘলরা এদের সহায়তার ওপর বিশ্বাস রাখতে বাধ্য হয়েছিল।[২] উনি বিভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন, যেমন—শিক্ষা এবং জমির মালিকানা ইত্যাদি, যা বিচার করে বহু প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, ভদ্রলোকেরা আসলে ঐতিহ্যগতভাবে অভিজাত, যা গড়ে উঠেছে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ এই তিন বর্ণের সংমিশ্রণে। তারা উচ্চ সামাজিক অবস্থান উপভোগ করে এসেছে এবং অধস্তন শাসক ও ভূস্বামী হিসেবেও ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ক্ষমতা প্রদর্শন করে এসেছে।[৩] তথাপি ড. মুখার্জী মানতে রাজি নন যে, ভদ্রলোকেরা প্রায় সকলেই নিশ্চিতভাবে এই তিনটি উচ্চবর্ণ থেকেই এসেছে এবং উনি উল্লেখ করেছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে অন্যান্য বর্ণের স্বশিক্ষিত মানুষরাও, যেমন মতিলাল শীল, যিনি জাতে সুবর্ণবণিক ছিলেন এবং গৌরচাঁদ বসাক যিনি জাতে তাঁতি ছিলেন (তন্তুবায় বণিক শ্রেণিভুক্ত) তাঁরাও 'ভদ্রলোক' গোষ্ঠীর নেতা হয়েছিলেন। তথাপি আমাদের বক্তব্য হল যে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যেই 'ভদ্রলোক' শব্দটি এই তিনটি উচ্চবর্ণের সঙ্গে সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের 'ভদ্রলোক' শব্দটির সীমাবদ্ধ ব্যবহার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, যখন এই ত্রিদলীয় জোটটি গড়ে উঠেছিল, আর যাকে

ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের কাছে আর কোনো উপযুক্ত শব্দ ছিল না। 'অভিজাত' শব্দটি আবার এক্ষেত্রে একটু বেখাপ্পা বলে মনে হতে পারে। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাবলিকে বুঝতে হলে আমাদের দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতিগত জোটের মধ্যে ব্যবধানটা বুঝতে হবে। একটি হল বণিক শ্রেণি এবং অন্যটা ওই তিনটি উচ্চবর্ণের জোট। শেষেরটা হয়েছিল কিছু প্রয়োজন মেটাতে, যেগুলি ইংরেজরা বলে দিয়েছিল এবং তার জন্য 'ভদ্রলোক' শব্দটি বেশ উপযুক্ত। বহু ঐতিহাসিক তাঁদের নিজস্ব ভদ্রলোকদের সময় এবং স্থানিক প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন। এরকম দুটি কাজের কথা মনে পড়ছে। একটি হল জয়া চ্যাটার্জির *The Decline, Revival and Fall of the Bhadralok Influence in the 1940s* (২০০১) প্রবন্ধ এবং হালে প্রকাশিত বই পরিমল ঘোষের *What Happened to the Bhadralok* (২০১৬)। যাঁরা কেবলমাত্র এই তিনটি তথাকথিত উচ্চবর্ণের জোটকে ভদ্রলোক বলে মেনে নিতে এখনও বিমুখ, তাঁদের স্বাধীনতা রইল যে, তাঁরা ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে একটিকে বণিক শ্রেণি (যা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই) আর অন্যটিকে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য আর কায়স্থদের জোট বলে দেখতে পারেন।

নৃতত্ত্ববিদরা, যাঁরা বেশ সামঞ্জস্যহীন ভাবেই সময়ের একটি বিরাট অংশ বর্ণ ও জাতের পেছনে ব্যয় করেছেন (জাতি অর্থাৎ বর্ণগুলির বাস্তব একক বলতে যা বোঝায়) তাঁরা 'ভদ্রলোক' শব্দটি স্রেফ চিনেই উঠতে পারেননি। এই 'ভদ্রলোক' ব্যাপারটি সম্বন্ধে কোনো প্রামাণ্য নৃতাত্ত্বিক রচনা পাওয়া প্রায় অসম্ভব বলা যায়।

আমরা উল্লেখ করেছি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী বাংলার তিনটি উচ্চবর্ণের আনুপাতিক হার ছিল মোট জনসংখ্যার ৬.৪ শতাংশ এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এটি ছিল আর কম, মোট জনসংখ্যার ৫.১ শতাংশ। কিন্তু লক্ষ্য করতে পারি যে, এই তিন বর্ণের সমস্ত সদস্য কিন্তু 'ভদ্রলোক' শ্রেণিভুক্ত ছিল না। এটি আমরা পরের অংশে আরও খুঁটিয়ে দেখব। হতে পারে যে, এই তিন বর্ণের সদস্যদের পঞ্চাশ শতাংশই হয় যোগ্যতামানে পৌঁছোবার পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল না, বা তারা ছিল শ্রমিক অথবা কৃষকবংশীয়। আর এটাই তাদের 'ভদ্রলোক' অভিধার মূল থেকে দূরে রেখেছিল। এ প্রসঙ্গে আলোচনায় ব্রুমফিল্ড আর মুখার্জীর সঙ্গে এবারে আরও একজনকে নিয়ে নেব—রিচার্ড পি ক্রোনিন। উনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন, যেখানে 'ভদ্রলোক' হিসেবে সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তি সাধারণত তিনটি বাঙালি উচ্চবর্ণের সদস্যদের মধ্যেই সীমিত ছিল, কিন্তু অভিজাত সমাজের সদস্যপদ নির্ভর করত প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগ্রহণ, ইংরেজি এবং সংস্কৃত দুটোই।[৪] কী করে বাংলার এই সামান্য তিন শতাংশের গোষ্ঠী সরকারি চাকুরিগুলির ওপর তাদের একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করল, তা বুঝতে গেলে,

আমাদের এখন ব্রুমফিল্ড প্রদত্ত সংখ্যার দিকে নজর ফেরাতে হবে।[৫] ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে, তিনটি 'ভদ্রলোক' বর্ণ 'উচ্চ সরকারি নিয়োগ'-এর ৮০.২ শতাংশ দখল করে, যেখানে মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার ৫১.২ শতাংশ হলেও মাত্র ১০.৩ শতাংশ দখল করতে পেরেছিল। আর 'নিম্নবর্গীয় হিন্দু', যারা মোট জনসংখ্যার ৪১.৮ শতাংশ ছিল তারাও কেবল ৯.৫ শতাংশ অধিকার করতে পেরেছিল। জে এইচ ব্রুমফিল্ড এটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সামাজিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত এবং উচ্চস্তরের চেতনাসম্পন্ন গোষ্ঠী, আর্থিকভাবে জমির খাজনা, পেশা এবং কেরানির চাকুরিনির্ভর। উচ্চবর্ণ বলে সমাজে আলাদা এবং শিক্ষার ওপর দখল থাকার দরুন আমজনতার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখা, নিজেদের ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, জটিল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যেও সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রেখে চলা ইত্যাদি নিয়ে এরা প্রমাণ করেছে যে, দ্রুত সামাজিক ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা আদায় করতে এরা যথেষ্ট পটু।[৬] এই সংজ্ঞার প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু ব্রুমফিল্ড তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি দিয়ে 'ভদ্রলোক' হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে বাকি যে যে দিকগুলি স্থির করেছেন অর্থাৎ শুধু ওই তিনটি বর্ণের সদস্য হওয়া ছাড়া, যা সব বাঙালিই নিশ্চিতভাবে সত্য বলে জানে, সেগুলি আত্মস্থ করা যাক। তাঁর বইতে 'Bengali and Bhadralok' পরিচ্ছেদের গোড়াতে ব্রুমফিল্ড কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, যেমন—(ক) কায়িক শ্রম বা চাষবাসের কাজের প্রতি অনীহা, (খ) কিছু জমির মালিক হওয়া বা জমিদারি পাওয়ার অস্বাভাবিক আকর্ষণ, প্রধানত সামাজিক অবস্থান উচ্চতর করার জন্য, (গ) ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ, তা সে যে-কোনো মূল্যেই হোক না কেন, (ঘ) শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে আরও মনোনিবেশ করা, প্রায়শই যেটা হত সংগীতচর্চায়, (ঙ) শহরে বাসগৃহ বা বাসা তৈরি করতে পছন্দ করা, (চ) মাসমাইনের চাকুরি খোঁজা।[৭] এই যুক্তিকে প্রসারিত করেন তিথি ভট্টাচার্য, যিনি 'ভদ্রলোক'-দের সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছেন, তাঁর মতে, ১৮৪৮ এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রাধিকার এই দফাগুলিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। বাংলায়, দুর্ভাগ্যবশত, উচ্চবর্ণাশ্রম, স্বাভাবিকভাবেই 'ভদ্রলোক'-দের বৌদ্ধিক অস্তিত্বের অংশ হয়ে ওঠে যা তাদের হিন্দুচেতনাও হয়ে উঠেছিল।[৮]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'ভদ্রলোক' শব্দটি জনপ্রিয় হল কখন? এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র, বাংলাদেশের দিকে তাকাতে হবে, যে দেশের জনগোষ্ঠীর বৃহদংশই বাংলাভাষী। 'বাংলাপিডিয়া' বা 'National Encyclopedia of Bangladesh' বলছে "প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে শব্দটি প্রথম ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ভবানীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) কর্তৃক তাঁর সাহিত্যকর্মগুলিতে ব্যবহৃত হয়। দেশীয় কেরানি এবং পাতি কর্মচারীরা, যারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজ্যকে সেবার কাজে রত ছিল, অর্থাৎ গোমস্তা, নব্য জমিদার এবং উদ্যোগপতিগণ, তারা ব্যঙ্গধর্মী নাট্যকর্মগুলি যেমন *কলিকাতা কমলালয়* (১৮২৩), *নববাবুবিলাস* (১৮২৫) এবং *নববিবিবিলাস* (১৮৩১) ইত্যাদির বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। ভবানীচরণও এই উদীয়মান শ্রেণিকে বিদ্রূপ করেছিলেন 'ভদ্রলোক' শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা।" 'বাংলাপিডিয়া'ও একে বর্ণনা করেছে এইভাবে, যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে এক অভিজাত সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। আধুনিকতা পূর্ববর্তী যুগে, 'ভদ্র' এই সংস্কৃত শব্দটি অনেক রকম গুণাবলি বোঝাত। তার মধ্যে পড়ত বিষয়সম্পত্তি, বিশেষ করে বাস্তুভিটে। কাউকে প্রদত্ত বাস্তুভিটে, যার কোনো খাজনা দিতে হত না, সেটিকে বলা হত 'ভদ্রাসন'। 'ভদ্রাসন'-এর মালিক হচ্ছেন ভদ্র অথবা আরও গভীরে গেলে বলা যায় ভদ্রলোক, অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকানা এক জরুরি শর্ত।

এরপরে 'বাংলাপিডিয়া' শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রভেদ তৈরি করে এবং 'ভদ্রলোক' শব্দটিকে তার বয়ে বেড়ানো 'সম্মান'-এর সঙ্গে যোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন করে। তার মতে, 'ভদ্রলোক' শ্রেণিটি 'ভদ্রাসন' থেকে আসেনি, এসেছে কেরানি, বাণিজ্যিক এবং নব্য ভূস্বামী শ্রেণি থেকে, যারা ইউরোপিয়ানদের সঙ্গ করে ও তাদের সঙ্গে ব্যবসা করে তাদের ভাগ্য ফিরিয়েছিল। তারা অঢেল সম্পদ জমা করে, ভবানীচরণের মতে, ইউরোপিয়ানদের সংস্পর্শে আসার পরে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তারা তাদের পিতৃ-পিতামহের ধর্ম এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ে। আমাদের কিন্তু সযত্নে এর অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝতে হবে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই যে এই শব্দটির ব্যবহারকারী প্রথম ব্যক্তি সেকথা পণ্ডিতরাও স্বীকার করেন। তিনি ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর *কলিকাতা কমলালয়*-তে শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন। *কলিকাতা কমলালয়*-এ ভদ্রলোকের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল মূলত একজন শিক্ষিত বঙ্গসন্তান হিসেবে যিনি দীর্ঘক্ষণ অফিসে কাটিয়ে তাঁর শহরের আস্তানা, 'বাসা'-য় ফিরে যান, যেটি তাঁর অস্থায়ী ঠিকানা। এ প্রসঙ্গে ভট্টাচার্য বলেছেন,[৯] ভদ্রলোকদের প্রাচীন প্রজন্মের আসল বাড়ি, যা তাদের পৈত্রিক গ্রামে ছিল এবং যেখানে তারা প্রায়শই যাওয়া-আসা করত, তার সঙ্গে তাদের শহুরে আস্তানা বা 'আশ্রয়'-এর যে চারিত্রিক পার্থক্য ছিল, এবং তা বোঝাতে তিনি সুমিত সরকারকে[১০] অনুসরণ করেছেন।

এরপরে আমরা সংকলিত *বিবর্তনমূলক অভিধান* বা *Diachronic Dictionary of the Bengali Language* বইটির কথা আলোচনা করব। এই বইটি শব্দের প্রাথমিক অবস্থার বিবর্তনের উৎস সন্ধানের চেষ্টা করে। ঢাকার বাংলা আকাদেমি ২০১৩

খ্রিস্টাব্দে *বিবর্তনমূলক অভিধান* নামক এই বৃহদাকার তিন খণ্ডের পুস্তকটি প্রকাশ করেছে, যেটি বহু গবেষকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। এটি 'ভদ্রলোক' শব্দটি ব্যবহারের প্রথম তারিখটি আরও সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়। সেটি হল ১৮২১, ১৮২৩ নয়। এই অত্যন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর অভিধানটি অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, শব্দটি ছাপার অক্ষরে আবির্ভূত হয় *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে। অভিধানটি, ঘটনাচক্রে, উল্লেখ করেছে যে ওই একই কাগজে কথাটি আবার ছাপা হয় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে। অভিধানটি শব্দটির আরও ব্যবহার খুঁজে বের করেছে চলিত ভাষায় এবং জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্যকর্মের মধ্যে। আমাদের কাজের জন্য, আমরা এখন একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পেলাম, যখন এই শব্দটি ব্যবহার হতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এটাকেই এ বিষয়ে শেষ কথা বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়, কারণ মনে রাখতে হবে যে, একটি নতুন শব্দ পথ থেকে বৈঠকখানায় বা বৈঠকখানা থেকে রান্নাঘরে পৌঁছোতে যথেষ্ট সময় নেয়। যাই হোক, আমরা কিন্তু এখনও ছাপার বাইরে আমজনতার মধ্যে শব্দটি ব্যবহারের কোনো উল্লেখ পাইনি। সে অর্থে হয়তো বিতর্ক উঠতে পারে যে, নবকৃষ্ণ দেব এবং পূর্বোল্লিখিত লোকজনেরা কেউই ভদ্রলোক নন, কারণ শব্দটির খেলা তখনও শুরু হয়নি, কিন্তু এ বিতর্ক নিষ্ফল। যেমন সুমিত সরকার আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভদ্রলোক সম্প্রদায়' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন ওই একই অর্থ বোঝাতে।[১১]

'ভদ্রলোক' জাতির প্রথম উল্লেখযোগ্য তালিকাটি প্রস্তুত করেন রাধাকান্ত দেব ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে এইচ টি প্রিন্সেপের অনুরোধে, যেটি এস এন মুখার্জি পুনর্লিখিত করেছেন তাঁর প্রবন্ধ *Caste, Class and Politics in Calcutta, 1815-38*[১২]। আমরা দেখেছি, 'ভদ্রলোক' শব্দটি ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে ১৮২১-২২ খ্রিস্টাব্দে এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কলিকাতা কমলালয়* বইটি তখনও ছাপা হয়নি। দেব মহাশয়ের তালিকায় 'ভদ্রলোক' কথাটি না থাকায় তাই আশ্চর্যের কিছু নেই বরং সেখানে জোর দেওয়া হয়েছে, ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশের মাননীয় এবং ধনী দেশজ অধিবাসী-দের ওপর[১৩]। 'ভদ্রলোক' জোটের মধ্যেকার জাতপাতের অনুপাতের কথা আলোচনা করতে গেলে নানা গঠনের মধ্যে দিয়ে পানসি চালিয়েই আমাদের এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। তালিকায় উল্লিখিত ২৩টি শীর্ষে থাকা পরিবারের মধ্যে ১২টি ছিল কায়স্থ, ৩টি ব্রাহ্মণ, ১টি বৈদ্য—যা প্রমাণ করে ভদ্রলোকদের তিনটি মূল জাত ছিল মোট ১৬ জন বা ৬৫ শতাংশ। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে দেব মহাশয়ের তালিকার প্রায় ৭০ শতাংশ জুড়ে ছিল তারা। ওই তালিকায় আর যেসব অন্যান্য জাতের নাম স্থান পেয়েছিল, তার মধ্যে দেখতে পাই, যে তিনজন সুবর্ণবণিক, দুজন তন্তুবায়

(আদতে তন্তুবায় বণিক শ্রেণি), একজন তিলি এবং একজন শুঁড়ি রয়েছে। কলকাতার জাতপাতের অবস্থানের প্রথম তালিকাটি এইভাবে গ্রথিত হয়, যার সূত্রপাত আমরা ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল বলে মনে করতে পারি।

রাধাকান্ত দেবের তালিকাটি নির্ভুল ছিল না, তবে এটিই প্রথম কিছু প্রামাণ্য তথ্য দেয়। এতে রামমোহন রায়ের নাম ছিল না—হয়তো তিনি কলকাতায় বসবাস শুরু করেন তালিকা প্রস্তুতের মাত্র আট বছর আগে এবং সম্ভবত তিনি তখনও বনেদিয়ানা বা আভিজাত্যের যোগ্যতামানে পৌঁছোতে পারেননি। অথবা তাঁর নামটি রাধাকান্ত দেবের কাছে অভিশপ্ত বলে মনে হয়েছিল, কারণ দেব ছিলেন গোঁড়া এবং ধর্মপরায়ণ হিন্দু আর রামমোহন ছিলেন কালাপাহাড় সমাজ সংস্কারক। এস এন মুখার্জী আরও গুরুত্বপূর্ণ নাম বাদ পড়ে যাওয়ার কথা বলেছেন, যেমন—বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল শীল, রামকমল সেন, হিদারাম বাঁড়ুজ্যের পরিবার, বিশ্বনাথ মতিলাল, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃন্দাবন মিত্র এবং কালীনাথ মুখার্জী। কিন্তু এই নামগুলি বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখব যে, জাতিগতভাবে এদের মধ্যে চারজন ছিলেন ব্রাহ্মণ, দুজন কায়স্থ, একজন বৈদ্য এবং মাত্র একজন বণিক শ্রেণিভুক্ত। যদি ওই আটজনকে দেবের তালিকায় যোগ করা যায়, তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই তিনটি উচ্চবর্ণ তাদের শতাংশ বাড়িয়ে ৭৫ করে ফেলবে। এই বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য। অর্থাৎ ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে, দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ জোট বণিক শ্রেণির থেকে অধিক ধনী এবং ক্ষমতাবান ছিল। মনে রাখতে হবে যে, বণিকরা ব্রিটিশ শাসনের ফলে সর্বাপেক্ষা বেশি লাভবান হয়েছিল এবং মধ্যযুগ থেকেই তারা বাংলায় ঐশ্বর্যের প্রতিভূ ছিল। ১৬৯০-তে জোব চার্নক এসে ব্যবসাকেন্দ্রটিকে হুগলি নদীর পূর্বপাড়ে স্থানান্তরিত করার আগে থেকেই তারা কলকাতা এবং অন্যান্য লাভজনক বাজারে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে বণিক শ্রেণি, ইংরেজদের ব্যবসার সহযোগী হওয়ার পরও ওই তিন বর্ণের জোটের হাতে পরাস্ত হয়, যারা 'ভদ্রলোক' শব্দটির ওপর একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করে বসে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগের মাঝখান থেকে।

পরিশেষে ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে পৌঁছোবার পূর্বেই যে বছরটিকে সন্ধিক্ষণ বলে উল্লেখ করেছিলাম, একবার তাকে কেন্দ্র করে ওই তিনটি আলোচ্য জাতির বিষয়টিকে ছুঁয়ে যাওয়া যাক। জাত বলতে আমরা মোটামুটি যা উপলব্ধি করতে পারছি, তা আসলে একধরনের সামাজিক গঠন, যা একজন মানুষ পুরো সামাজিক ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগটিকে কী চোখে দেখে, তার ওপর ভীষণভাবে নির্ভর করে। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যখন এই 'ভদ্রলোক'-দের খেলা চলছে, বাংলা তখনই

জাতপাতের ভাগাভাগির বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল। নৃতত্ত্ববিদরাও একমত যে, 'বিশুদ্ধ' জাতি বলে কিছু হয় না। কিন্তু এই বাস্তব জানা থাকা সত্ত্বেও সব জাতই অবশ্যম্ভামীভাবেই উচ্চ সামাজিক মর্যাদা দাবি করে, অন্তত অন্য কারও তুলনায় উঁচু এবং নিজেদের বিশুদ্ধ রক্তের গৌরবকেও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সব সামাজিক শ্রেণিতেই দেশীয় রক্ত অনুপ্রবেশ করেছে, একথা মানতে দ্বিধা নেই, তথাপি একই জাতির উপজাতিগুলির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ। প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীই দাবি করে যে, তারা নিরঙ্কুশ বিশুদ্ধ রক্তের দাবিদার এবং তাদের পূর্বপুরুষ কোনো এক পৌরাণিক চরিত্র, যারা গাঙ্গেয় উপত্যকার কোনো বিশুদ্ধ বংশ থেকেই বাংলায় এসেছিল।

এরপরে আসে জাতের ক্রমানুপাত অনুসারে বৈদ্যদের স্থান, যাদের নিজেদের উৎপত্তির গল্প আছে, যা তাদের মনু কথিত অম্বাষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত করে। কারণ তারা নিজেদের মর্যাদায় ব্রাহ্মণদের সমান বলে দাবি করে এবং ব্রাহ্মণদের দিক থেকেও তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়। পরিশেষে বাঙালি যে মীমাংসার পথ অবলম্বন করে, তা হল যে, ব্রাহ্মণরা তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ করবে তাদের মৃত্যুর এগারো দিন পরে, উচ্চবর্গীয় কায়স্থরা করবে তেরোদিন পরে, বৈদ্যরা করবে বারো দিন পরে। সন্দেহ নেই ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য এই দুই স্তরের মধ্যে কিছুটা সামাজিক সচলতা ছিল, বিশেষ করে কিছু দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ধর্মীয় পদ্ধতি কবজায় আনার জন্য। কিন্তু জাতের প্রসঙ্গ এলেই দেখব যে, সামাজিক মর্যাদার ব্যাপারে ব্রাহ্মণরা যথেষ্ট রক্ষণশীল। তাই প্রায় দেড় শতক পর রিজলি উল্লেখ করেছেন ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দেও একটি জনপ্রিয় প্রবাদ বাজারে চলত—'ওঠা আর পড়া বদ্যিদের ভাগ্য, যদি আসল বংশ টিকে থাকে'[১৪]। লক্ষ্যণীয় দুটি গোষ্ঠীর তুলনায় বৈদ্যদের গোষ্ঠীটি ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

বৃহত্তর কায়স্থ গোষ্ঠীর কথা বলতে গেলে সেটি ছিল অপেক্ষাকৃত সচ্ছিদ্র। প্রাক্-আধুনিক যুগে কীভাবে কিছু উৎসাহী পরিবার, গোষ্ঠী এবং উপজাতি সমাজের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে, সে সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। কায়স্থরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই স্থানীয় মানুষ, কারণ বাংলার বাইরে অন্য কোনো জাতের সঙ্গে তাদের কোনো রক্তের সম্পর্ক বা আত্মীয়তা পাওয়া যায় না, এমনকি একই নামধারী উত্তর ভারতীয় জাতির সঙ্গেও না। তবুও তারা দাবি করে তারা কোনো এক পৌরাণিক অতীতকালে বাংলায় এসেছিল এবং তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতের নৃতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ-এর *Peoples of India* গ্রন্থমালার খণ্ডগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের অধীনে রয়েছে যে কায়স্থরা, তারা কেবলমাত্র মধ্যযুগে এসে একটি জাতি হিসেবে দানা বাঁধে[১৫]। আসলে কায়স্থদের নীচের স্তরটিকে, যাকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে, যেমন বাহাত্তরঘর, বা

বংশজ[১৬], তারা উপস্থিত। রিজলি অন্যান্য কিছু সামাজিক গোষ্ঠীর কায়স্থদের মধ্যে ঢুকে পড়ার কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন আমরা ইতিহাস জুড়েই দেখেছি এরকম জাতিগত সচলতা। ব্রাহ্মণদের জন্য সুবিধাজনক বংশতালিকা তৈরি হল উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়েই। আমাদের কাজের জন্য আমরা মনে রাখব কায়স্থদের কেবল দুটি উপরদিকের স্তর, তিন, চার বা পাঁচটি পদবিযুক্ত কুলীন (কোন ব্যাখ্যাটি গৃহীত হবে তার ওপর নির্ভর করে) এবং মৌলিক বা সাতঘর বা আটঘর (আবারও, সেটি সমধর্মী গোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল), যেখানে সাত বা আটটি পদবি 'ভদ্রলোক' শ্রেণির সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়, যদি তারা অন্যান্য শর্তগুলি পূরণ করতে সক্ষম হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে কায়স্থদের মধ্যে একমুখ খোলা রাখার প্রবণতা অধিক দেখা গেছে।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল বাংলার এই বর্ণ বা জাতিব্যবস্থার প্রয়োগগত প্রযুক্তির ব্যাখ্যা করেছেন এবং ব্রাহ্মণদের নেওয়া বিধিসম্মত অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করেছেন, যেমন, ব্রাহ্মণ ছাড়া সমস্ত জাতিই শূদ্র এবং কীভাবে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধর ধারণা 'জলঅচল' নীতি দিয়ে নিশ্চিত করে দেওয়া হল। তাঁর মতে, বাংলায়, বৈদ্য এবং কায়স্থরা শূদ্রদের মধ্যে সর্বোচ্চ দুই শ্রেণি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে শুচি শূদ্রদের মধ্যে উচ্চতম স্থান অধিকার করে।[১৭] তিনি বারবারই বলেছেন যে, সংস্কৃতায়ণের যে মাপকাঠি গ্রহণ করা হয়েছিল বা কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছিল, তা সামাজিক ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ স্থির করে দেয় এবং মন্তব্য করেন যে, বৈদ্য এবং কায়স্থরা এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রসর জাতি বলে গণ্য হত[১৮]। সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে 'শুদ্ধতা' বিষয়ে এবং ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ এই জটিল আলোচনার মধ্যে সবথেকে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল, এই বিতর্ক কিন্তু তিনটি উচ্চবর্ণকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। এটি বৈদ্য এবং কায়স্থদের ভারতের অন্যান্য প্রান্তে ব্রাহ্মণদের জাতিগত কৌলিন্য বদলে কঠিন নিয়ম করে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে জোট বাঁধতে সক্ষম করে তোলে। সান্যাল স্বীকার করেছেন, একটি জাতের মধ্যে অশুদ্ধতা তাদের প্রতি ব্রাহ্মণদের মনোভাব দিয়ে মাপা হত[১৯]—তাই স্বীকার করতেই হয় সবটাই অত্যন্ত বিষয়গত ভাবনা।

১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে যখন এরা ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে কাজ করবে বলে স্থির করল এবং বণিক শ্রেণিকে সরিয়ে সেই স্থান গ্রহণ করল, তখনই এগুলি তাদের মধ্যে ঢোকে। বৈদ্য এবং কায়স্থরা শেষ অবধি বাঙালি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভদ্রলোক গোষ্ঠীতে কীভাবে জোট বাঁধল সেটি জানতে হলে আমাদের এই বৃহত্তর প্রদেশের সঙ্গে অন্যান্য উত্তর ভারতীয় প্রদেশের সংস্কৃতিগত পার্থক্যগুলির মর্ম উপলব্ধি করতে হবে, যেখানে উচ্চবর্ণগুলির মধ্যে মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং যুদ্ধ প্রবাদতুল্য। সেখানে ব্রাহ্মণ, ভূমিহার, রাজপুত এবং কায়স্থরা গাঙ্গেয় ভূখণ্ডে লড়ে নেয় সবকিছু এবং একই রকম

জাতপাতের যুদ্ধ অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও মহামারীর আকার নিয়েছে। বাংলায় কিন্তু তেমন কোনো অবস্থা ছিল না। তাই এস এন মুখার্জির পর্যবেক্ষণ, ঔপনিবেশিকতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলার জাতপাতের কাঠামোটা ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের চেয়ে অনেক বেশি নমনীয় ছিল।[২০]

প্রথমত, মধ্যযুগের শেষদিকে বাংলার প্রায় অধিকাংশ ভাগই সুফিবাদ এবং ইসলামের দ্বারা আন্দোলিত হয়, যা হিন্দুদের জাতি হিসেবে সংখ্যালঘু করে দিয়েছিল—ঊনবিংশ শতকের জনগণনাতে তা প্রমাণিত। খুব বেশি হলে বর্তমানে বাংলা ভাষাভাষীদের মাত্র ৩৪ শতাংশ মুক্তকণ্ঠে হিন্দু বলে নিজেদের স্বীকার করে—সেটিও দলিতদের নিয়ে। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ছোট্ট গোষ্ঠীর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, যে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বিশাল জোট এবং দুর্বার মুসলমান কৃষক গোষ্ঠীর প্রতি তাদের অবজ্ঞা একইরকম ছিল। আবার এই জাতিগুলি বাঙালি মুসলমানদের বাঙালি বলে স্বীকার করত না। এই মনোভাব থেকেই 'আমরা বাঙালি ওরা মুসলমান'—এমন কথা বারবার শুনেছি। অর্থাৎ আমরা হিন্দুরা বাঙালি আর ওরা মূলত মুসলমান। বাঙালি হিন্দুরা নিজেদের অশুদ্ধি থেকে রক্ষা করতে মুসলমানদের সবকিছুকে অগ্রহণীয় বলে মনে করত—তাদের লুঙ্গি পরিধান, তাদের পেঁয়াজ-রসুনের রান্না, তাদের মুরগি, গোরুর মাংস খাওয়া ইত্যাদি প্রথাকে। এইরকম একটি সংস্কৃতিগত বিভাজন হিন্দু আর মুসলমানদের আলাদা করে রেখেছিল, যেটি ৫ কি ৬ শতাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দু আরও বেশি করে মানত। এই মনোভাব 'ভদ্রলোক' গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ তীব্রভাবেই প্রতিফলিত হল।

এর আর-একটি দিকে নজর দেওয়া লাভজনক হবে, সেটি হল ধর্ম আর শিক্ষার ব্যাপারে বৈদ্য এবং কায়স্থরা ব্রাহ্মণদের প্রায় সমান সমান ছিল। কারও কোনো ধারণাই ছিল না যে, এই দুটি জাত কবে দিগন্তে উদিত হল, যদিও আমরা চতুর্দশ শতক বা তার আশপাশ থেকেই তাদের 'আগত অস্তিত্ব' টের পেয়েছিল। আমরা দেখব যে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকে[২১] মহাভারতের প্রাচীন অনুবাদকরা বা সংস্কৃত থেকে বঙ্গানুবাদকদের একটি অংশ, যেমন কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস এবং শ্রীকর নন্দী, কায়স্থ ছিলেন। ওই একই সময়ে, ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, আমরা দেখেছি কীভাবে একজন বৈদ্য শ্রেণিভুক্ত মানুষ, বিজয় গুপ্ত *মনসামঙ্গল* রচনা করেছেন, একজন কায়স্থ সম্প্রদায়ের লোক, মালাধর বসু *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* রচনা করেছেন। আমরা নারায়ণ দেবের কথাও জানতে পারি, যিনি *পদ্মপুরাণ* লিখেছিলেন, যা *মনসামঙ্গল*-এরই অপর নাম। দীনেশচন্দ্র সেনের লেখায় পাই, যোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের খুব কাছের সহযোগীদের মধ্যে কয়েকজন বৈদ্য এবং কায়স্থ ছিলেন—মুরারি গুপ্ত, পরমানন্দ সেন, নরহরি

সরকার, বাসুদেব ঘোষ, মাধবানন্দ ঘোষ এবং রঘুনাথ দাস[২২]। এই বৈপ্লবিক ধর্মীয় আন্দোলনে যুক্ত আরও কিছু বৈদ্য এবং কায়স্থের কথা জানা যায়, যেমন শিবানন্দ সেন।চৈতন্যের জীবনী লেখেন বৈদ্য শ্রেণির মুরারি গুপ্ত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ এবং প্রেমানন্দ সেন। সপ্তদশ শতকে, আমরা দেখতে পাই যে, কায়স্থ কাশীরাম দাস *মহাভারত* অনুবাদ করে প্রভূত খ্যাতিলাভ করেন। এই জাতির আরও অনেকে, যেমন নরসিংহ বসু, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ এবং মাণিক দত্ত[২৩] মঙ্গলকাব্যের ধারাটি বহন করে নিয়ে যান। আবারও বলি, বাংলায় যদি শিক্ষা বা ধর্মের কথা বলা যায়, এই দুটি জাতই ব্রাহ্মণদের থেকে কিছু কম ছিল না। আদতে তারাই চৈতন্যের অন্তর্ভুক্তি তত্ত্বের ফলস্বরূপ সর্বাপেক্ষা লাভবান হয়, কারণ তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বৃন্দাবনের ছয় গোঁসাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তাঁরা কিন্তু জাতের বাধাগুলি আবার ফিরিয়ে আনেন, যা চৈতন্য অনেকাংশে শিথিল করেছিলেন। তবে পরিচ্ছন্ন শূদ্র হিসেবে কায়স্থ এবং বৈদ্য শ্রেণি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে গেঁড়ে বসে থাকে, যারা গোস্বামীদের কাছে গ্রহণীয় হয়েছিল।

আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। আমরা দেখেছি যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে কলকাতা তথা বাংলায় ব্রিটিশরা সাধারণত বণিক বা ব্যবসায়ী শ্রেণির মারফত ব্যবসা চালিয়েছে। বিশেষত তন্তুবণিক বা যারা তাঁতি শ্রেণির ব্যবসায়ী ছিল তাদের সঙ্গে। আর একটু বিস্তারিতভাবে বলি। এন কে সিনহা তাঁর *Economic History of Bengal*-এর প্রথম খণ্ডে বলেছেন যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ব্রিটিশদের ব্যবসায় পদ্ধতি বা 'বিনিয়োগ' (investment) ভারতীয় দালাল এবং প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্ধারিত হত এবং তাদের পক্ষ থেকে পণ্য কেনার জন্যে বা বায়না করার জন্যে 'দাদনী' নামক আগাম টাকা দেওয়ার রীতি মেনে আবর্তিত হত। কিন্তু প্রায়ই এই বণিকদের এইভাবে নিজেদের টাকা বিনিয়োগ করে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হত, কারণ পুরো ব্যবসা চালাবার জন্যে কোম্পানির অগ্রিম দেওয়া টাকা যথেষ্ট ছিল না। মাঝে মাঝে ওদের সরাসরি পণ্য সংগ্রহ করে ব্রিটিশদের কাছে নগদ টাকায় বেচতে হত, যাকে বলা হত 'নগদ পদ্ধতি' বা 'ready money system'। এইভাবে মূলধন বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা থেকেই বোঝা যায় যে, 'দাদনীবেনিয়ান'-দের হাতে নগদ থাকতেই হত। তা ছাড়া, এইসব লেনদেন হত প্রতিটি স্তরে প্রচুর দরদাম করে এবং কেবলমাত্র ওই দাদনী ব্যবসায়ীরাই, যারা সচ্ছল অবস্থার মানুষ ছিল, তারাই টিকে থাকতে সক্ষম হত। ড. সিনহা বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাদনী ব্যবসায়ীরা ছিল সুতানুটির *শেঠ* এবং বসাকেরা (কলকাতায়), যারা এই ব্যবসায় অন্যদের চেয়ে অগ্রাধিকার পেত কারণ তারা কলকাতায় বহুদিন ধরে বসবাস করছে এবং ব্রিটিশদের

ছত্রছায়ায় রয়েছে[২৪]। উনি উল্লেখ করেন, ১৭৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতায় নামকরা দাদনী ব্যবসায়ীরা হলেন গোপীনাথ শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, লক্ষ্মীকান্ত শেঠ, শোভারাম বসাক, উমিচাঁদ এবং কোটমা-রা[২৫]। এস এন মুখার্জী আর-এর কদম এগিয়ে বলেছেন, শেঠেরা ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে দাদনী রীতি উঠে যাওয়া অবধি কলকাতায় কোম্পানির দালালদের আপিস নিয়ন্ত্রণ করত[২৬]। তারপরে তিনি বেনিয়ানদের বাংলার ইতিহাসের উত্তরণের কাহিনি রচনার পর বলেন যে, ঊনবিংশ শতকের শুরু নাগাদ, এরা 'শ্রফ'-এ পরিণত হয় (যারা টাকা ধার দেয়) এবং তাদের বংশধরেরা ব্যবসাতে আধুনিক হয়ে ১৮২০ এবং ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি শিক্ষা এবং পশ্চিমি দর্শনে শিক্ষিত হয়[২৭]।

শুভ্রা চক্রবর্তী মনে করেন যে, ইংরেজদের সবরকমের ব্যবসার মধ্যস্থতাকারীদের একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে একশ্রেণিতে ফেলা ঠিক নয়, অর্থাৎ সকলেই বেনিয়ান নয় এবং এমন কিছু গবেষণার কথা তিনি উল্লেখ করেন, যেগুলির মত হল যে, মধ্যবর্তী শ্রেণির মধ্যে তাদের ভূমিকা অনুযায়ী একধরনের জটিল ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ ছিল, যেমন বেনিয়ান, দেওয়ান, ঠিকাদার, গোমস্তা, দালাল এবং পাইকার[২৮]। বেনিয়ানরা ছিল মুখ্য চালক এবং প্রবক্তা। পি জে মার্শালের মতে, বেনিয়ানরা আসলে *দস্তকের* আড়ালে থেকে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যবসা করত ও লাভ করত, যেখানে ব্রিটিশ কর্মচারীরা কেবল তাদের নাম এবং আইনসম্মত অধিকার দান করত—অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে[২৯]। ইউরোপীয়ানরা তাদের বেনিয়ান বা ভারতীয় প্রতিনিধিদের টাকায় ব্যবসা করে গেছে তাদের প্রভুর নাম এবং আইনি অধিকার ব্যবহার করে[৩০]। বুঝতে হবে যে, অষ্টাদশ শতকে, বাংলায় ব্রিটিশ শাসন নির্ভর করেছিল ভারতীয় অধস্তন প্রশাসকদের ওপর, যারা বেশিরভাগই সরকারি কর্মচারীর চেয়ে বেশি অংশে ঠিকাদার বা ফাটকাবাজ ছিল[৩১]। বেনিয়ানদের পরে আসে দেওয়ানরা, যারা অর্থ বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করত না কিন্তু বেনিয়ানদের হয়ে পুরো ব্যাপারটা দেখাশোনা করত। তারা উৎপাদন এবং সরবরাহ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করত তাদের চেয়ে নীচু পদে থাকা প্রতিনিধি অর্থাৎ গোমস্তা, দালাল এবং পাইকারদের নিয়ন্ত্রণ করে। দালাল আদলে উৎপাদক এবং সরবরাহকারীকে ক্রেতার কাছে নিয়ে আসত একটি দস্তুরির বিনিময়ে, গোমস্তারা ছিল শুধুমাত্র বেতনভোগী কর্মচারী এবং আমরা এই পদের উল্লেখ পাই ব্যবসায়ীদের কর্মচারী হিসেবে, যেমন, 'মাণিকচাঁদের গোমস্তা' আর তা পাই প্রাচীনকাল থেকেই[৩২]।

গোমস্তারা ব্যবসার প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে আবহাওয়া একটু খারাপ হতে শুরু করে। ড. সিনহা ব্রিটিশ নথি থেকে উল্লেখ করেছেন, দাদনী ব্যবসায়ীরা নিজেরাই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা করতে খুব একটা আগ্রহী ছিল না এবং ফরাসী বা ডাচদের জন্যে পণ্যের বন্দোবস্ত করে

দেওয়া অধিক লাভজনক এবং অধিক সহজ বলে তারা মনে করত।[৩৩] বেনিয়ানদের দুর্নীতি, ঔদ্ধত্য ইত্যাদির কারণে কোম্পানির পরিচালকরা ভারতে চাকুরিরত তাদের কর্মচারীদের বেনিয়ানদের ত্যাগ করতে পরামর্শ দেন। ইতিহাসের এই অংশটি আগেও আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এবারের পরীক্ষার নতুন আবিষ্কার হচ্ছে খেলোয়াড়দের জাতিগত চরিত্র। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি বাংলার যে এক শ্রেণির ভারতীয় উদ্যোগপতিকে সমর্থন করেছে এবং ধনী করেছে, তারা নিঃসন্দেহে তন্তুবণিকদের ব্যবসায়ী শ্রেণি এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিয়ে গঠিত বেনিয়ান গোষ্ঠী। এ প্রসঙ্গে ড. কালীকিঙ্কর দত্ত বলেছেন যে, দাদনী ব্যবসায়ীরা সবসময় যে দাদনীর পুরো টাকা বিনিয়োগ করেও যে তার সদ্ব্যবহার করতে পারত বা ভালো ব্যবসা করতে পারত, তা কিন্তু নয় এবং ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় যে কোম্পানির পরিচালকরা কলকাতায় কাউন্সিলের সদস্যদের কাছে নির্দেশ পাঠাচ্ছেন যে, তারা যেন দাদনীদের অগ্রিম সামান্য হলেও দিয়ে দেয় এবং নগদ টাকা দিয়ে পণ্য কেনার জন্য যেন তাদের উৎসাহ প্রদান করেন। স্বভাবতই, ব্যবসায়ীরা আরও বেশি ঝুঁকি নিতে এবং নিজেদের অর্থে কোম্পানির হয়ে আরও বেশি পরিমাণে মাল কিনতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়ত এবং তারপরে ইংরেজদের সঙ্গে দাম আর গুণমান নিয়ে দর কষাকষি করতে শুরু করত। একটু দেরি হলেও কোম্পানির উপায় বিশেষ থাকত না। তাই তারা পারিশ্রমিক পেয়ে যেত[৩৪]।

সমস্যা যে ছিলই, তা বোঝা যায়, যখন দেখি ৩০ নভেম্বর ১৭৪৬ তারিখে লন্ডনে পরিচালন সমিতিকে লেখা একটি দীর্ঘ চিঠিতে কলকাতার কাউন্সিল জানাচ্ছে যে, ব্যবসায়ীরা আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছে এবং ইংরেজদের কোম্পানির অল্পবিস্তর যে নতুন শর্তাবলি সেগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পলাশির যুদ্ধের আগে ইংল্যান্ড বাংলায় সবচেয়ে শক্তিশালী খেলোয়াড় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি এবং বণিক শ্রেণি স্বভাবতই ওদের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ গোমস্তা, করণিক এবং নগদ রক্ষকদের মতোই প্রভু হিসেবেই দেখত। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পরও কলকাতার বেনিয়ানরা তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক অংশীদারের মতোই ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল। তারা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের গুরুত্ব তখন উপলব্ধি করতেই পারেনি। অন্যদিকে নতুন গোষ্ঠীর আগমন ঘটল, যাদের গোমস্তা বলা হচ্ছিল। তারা এবার সম্পদশালী হতে শুরু করল কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের বদান্যতায়।

আগের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। আমরা যদি আলোচ্য সময়ের তথ্যাদি সংবলিত দুটি বৃহৎ খণ্ডে, *Home (Public) Proceedings of 1753*, Vol. I (January-June) Vol. II (July-December) পর্যালোচনা করি,[৩৫] তবে দেখব যে, এই বণিক শ্রেণির

বেনিয়ানরা কীভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আমাদের কাছে বিস্তারিত বিবরণ আছে কীভাবে লন্ডন অফিস শেষ অবধি ফোর্ট উইলিয়ামের কলকাতা কাউন্সিলের প্রস্তাবে রাজি হতে বাধ্য হয়। কাউন্সিলের প্রস্তাবটি ছিল বেনিয়ানদের মাল কেনার টাকা অগ্রিম দেওয়ার প্রথা (দাদন বা দাদনী) তুলে দিয়ে তাদের বদলে কোম্পানির নিজস্ব গোমস্তা নিযুক্ত করা। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের গোড়ায় আনা এই প্রস্তাবটি লন্ডনের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালন সমিতির কর্তাদের অনুমোদন পেয়েছিল কিনা, তা ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর তারিখের কার্যবিবরণী পরীক্ষা করলে বোঝা যায়। ঠিক কী লেখা ছিল পড়বার আগে মানতে হবে যে, কলকাতা কাউন্সিল থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালন সমিতির সদস্যদের কাছে জাহাজে চিঠি পৌঁছাতে কয়েক মাস সময় লাগত। এই সময়ের চিঠিপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ফোর্ট উইলিয়ামের কাউন্সিল তাদের ক্রয়ের নিয়মগুলি বদলের নীতি স্থির করে ওই বছর জুন মাসের গোড়ায় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি চিঠিটি লেখা ৩ সেপ্টেম্বর ১৭৫৩, যাতে লেখা আছে আমরা একটি প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, যা প্রথম প্রবেশদ্বারে সাঁটা হবে, তাতে জানানো হবে যে, আমরা মহামান্যের অধীনে অর্থাৎ কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে আড়ং-এর গোমস্তা নিয়োগ করতে ইচ্ছুক।[৩৬]

এই নতুন নিয়মের পর কলকাতায় কাউন্সিল দাদনী বা আগাম দেওয়ার অনুপাত কমাতে গেলে বেনিয়ানরা তার বিরোধিতা করে, বলতে থাকে যে তাদের পূর্বেকার অবস্থান থেকে স্থানচ্যুত করা যাবে না এবং দাদনী বাবদ ৮৫ শতাংশ অগ্রিম দিতেই হবে[৩৭]। এর পরের সমস্ত লেখায় বারবার বণিকদের নতুন চুক্তিপত্রে সই করতে না চাওয়ার কথাই লেখা আছে এবং ডেনিশ আর মারাঠাদের দ্বারা তৈরি করা সমস্যার কথাও আছে[৩৮]। কোম্পানির অভিনব প্রস্তাব শেষ অবধি বহু পুরোনো দাদনী প্রথা বাতিল করে এবং নিজেদের গোমস্তাদের বিভিন্ন আড়ং-এ (গ্রামের দোকান যেখানে তাঁতিরা কাপড় বোনে এবং সেখান থেকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কাপড় কেনা হয়) পাঠানোর ব্যাপারটিও পরিষ্কার বোঝা যায়। এর স্বপক্ষে বলা হয় যে কোম্পানির নিজস্ব গোমস্তারা কোম্পানির নির্দিষ্ট দরেই সেরা পণ্যটি কিনতে সক্ষম হবে। কিন্তু কোম্পানির এই নবনিযুক্ত ভারতীয় ভৃত্যেরা যে নিজ নিজ ব্রিটিশ প্রভুদের জন্যে ব্যক্তিগত ব্যবসা করতে চলেছে এবং নবাবের শুল্কমুক্ত *দস্তক*-এর সুযোগ নিয়ে, যা কেবলমাত্র কোম্পানির ক্রয়ের জন্যই দেওয়া হত, সে বিষয়ে কোনো কানাঘুষো শোনা যায়নি। সবথেকে বড় কথা যে, কোম্পানির নিজস্ব কার্যবিবরণীতেও কর্মচারীদের দুর্গতির বিষয়ে কোনো সন্দেহই নজরে আসে না। এটি কার্যকর করা হয় জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের Home (Public) Proceedings-এর প্রথম খণ্ডতে দেখি

যে, ২০ জুন, রজার ড্রেক নামে একজন বণিক, কলকাতার কাউন্সিলকে জানাচ্ছেন যে, বেশ কিছু মানুষকে কোম্পানির পক্ষ থেকে আড়ং-এর গোমস্তা, নগদ রক্ষক এবং করণিকের চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। কাউন্সিল স্থির করে যে, তাদের চরিত্র ও সততাত বিষয়ে নিশ্চিত হলেই তাদের কথা বিবেচনা করা হবে[৩৯]। ওই একই পৃষ্ঠায় আবেদনকারীদের নাম এবং তাদের জামানতের কথা লেখা আছে। অর্থাৎ ওইসব ব্যক্তি যদি কোম্পানির ক্ষতিসাধন করে ফেরার হয়ে যায়, তবে জামিনদার সেই ক্ষতিপূরণ করবে। এবার দেখা যাক কোন্ কোন্ ব্যক্তি মনোনীত হয়েছিল—

১। কিষেণদাস টেগোর (ব্রাহ্মণ), যিনি ৭৫ টাকা মাসমাহিনায় গোমস্তা হিসেবে নিযুক্ত হন, তাঁর জামিনদার ছিলেন গোবিন্দরাম মিত্র (কায়স্থ)।

২। রামসুন্দর দাস (জাত জানা যাচ্ছে না) নগদরক্ষক নিযুক্ত হন ২৭ টাকা মাসমাহিনায়, পরমানন্দ বসাক (তন্তুবায়) জামিনদার ছিলেন।

৩। সীতারাম কর (কায়স্থ) অধীনস্থ গোমস্তা, মাসমাহিনা ৩০ টাকা, জামিনদার গোবিন্দরাম মিত্র (কায়স্থ)।

৪। রামানন্দ চক্রবর্তী (ব্রাহ্মণ) অধীনস্থ গোমস্তা, মাসমাহিনা ৩০, জামিনদার গোবিন্দরাম মিত্র (কায়স্থ)।

৫। রামচরণ গুপ্ত (বৈদ্য) করণিক হিসেবে নিযুক্ত ২০ টাকা মাহিনা, রানাউৎ সেন (বৈদ্য বা কায়স্থ) জামিনদার।

৬। নিমাই পালিত (কায়স্থ), গোমস্তা হিসেবে নিযুক্ত হন, মাহিনা ৬০ টাকা, রামজীবন কবিরাজ (বৈদ্য) এবং রামনারায়ণ বোস (কায়স্থ) জামিনদার।

৭। চন্দ্রমোহন বোস (কায়স্থ) নগদরক্ষক হিসেবে নিযুক্ত, ২২ টাকা মাহিনায়, দুর্গারাম মিত্র এবং কিষণরাম পালিত (উভয়ই কায়স্থ) জামিনদার।

৮। রাম চন্দর (সম্ভবত কায়স্থ) কারণিক হিসেবে নিযুক্ত ১৭ টাকা মাহিনায়, রামসুন্দর ঘোষ (কায়স্থ) জামিনদার।

৯। রামনাথ সরকার (কায়স্থ) করণিক হিসেবে নিযুক্ত ১৭ টাকা মাহিনায়, আনন্দরাম মিত্র (কায়স্থ) জামিনদার।

১০। বল্লীনাথ বোস (কায়স্থ), গোমস্তা ৫০ টাকা মাহিনায়, এনার জামিনদার একজন ব্রাহ্মণ, আনন্দকুমার মুখার্জী।

১১। জগন্নাথ নন্দী, নগদরক্ষক, ২৫ টাকা মাহিনা, কৃপারাম নন্দী জামিনদার—দুটি নামই কায়স্থ জাতিকে সূচিত করে।

১২। তোতারান্ড বোস (কায়স্থ), করণিক হিসেবে নিযুক্ত হন ১৫ টাকা মাহিনায়, নন্দরাম মিত্র (কায়স্থ) জামিনদার।

১৩। অল্লুমা চাঁদ গোমস্তা হিসেবে নিযুক্ত হন ৭০ টাকা মাহিনায়, রাধাকিষেণ বেলে জামিনদার—পদবিগুলি থেকে জাত বোঝা যায় না।

১৪। শুকদেব মজুমদার, নগদরক্ষক, ২৪ টাকা মাসমাহিনা, চন্দন মজুমদার জামিনদার। দুটি নামই কায়স্থ বা বৈদ্য হতে পারে।

১৫। জগত হাজারি, করণিক হিসেবে নিযুক্ত হন, ১৫ টাকা মাহিনায়, প্রতাপানন্দ চৌধুরী জামিনদার—দুটি পদবিই বেশ উচ্চশ্রেণির মনে হয়।

১৬। শুনোহরি ঠাকুর (ব্রাহ্মণ), করণিক, ১৫ টাকা মাহিনা, নাফসেরনানা ঘোষ (কায়স্থ) জামিনদার।[৪০]

আরেকটি আলাদা লেখা আছে ওই একই খণ্ডে যেখানে আরও কিছু নিয়োগের কথা বলা আছে—

১। রামসুন্দর বোস, নগদরক্ষক, ২০ টাকা, কোনো একজন বোস (নাম অস্পষ্ট) জামিনদার—১৮ জুন তারিখে, দুজনেই কায়স্থ।

২। কিষেণ চরণ মিত্র, করণিক, ১৫ টাকা। নন্দরাম মিত্র জামিনদার। এখানেও দুজনেই কায়স্থ[৪১]।

তালিকা উল্লিখিত নামগুলি থেকে ২৩ জুন প্রথম সাতজনকে ডাকা হয় এবং তাদের ‘জামিননামা’ লেখা হয়। আমরা যে নামগুলি পাই সেগুলি হল—চন্দ্রসুন্দর বোস, রাইচাঁদ কর, রামপ্রসাদ সরকার, কিষেণ দেব ঠাকুর, রামনিধি চক্রবর্তী, রামশরণ দাস এবং রামচরণ গুপ্ত[৪২]। এই তালিকা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যাপারে সামাজিক মর্যাদা অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পেত যথেষ্ট ধনী ও জনপ্রিয় ব্যক্তি জামিনদার হয়েছে কিনা, তা দেখা। ‘জামানত’ আসত তিনটি উচ্চবর্ণ থেকে এবং তারা শুধু ওই তিনটি বর্ণভুক্ত আবেদনকারীদেরই সাহায্য করত। একজন ব্রাহ্মণের কাছে এটি কোনো ব্যাপারই ছিল না যে, কে তার জন্যে জামিনদার দাঁড়াচ্ছে, এই তিনটি বর্ণভুক্ত হলেই তারা তাদের নাম এবং সম্পদ নিয়ে ঝুঁকি নিতে পারত। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে অন্য দুই জাতের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য ছিল। অর্থাৎ অর্থ লেনদেনের মতো ঝুঁকিপূর্ণ পেশাতেও হিন্দুদের সমাজে উচ্চবর্ণের মধ্যে এক অলিখিত বোঝাপড়া বহুদিন থেকেই চালু ছিল। কী করে এটি পূর্বেকার গবেষকদের চোখ এড়িয়ে গেল তা সত্যিই আশ্চর্য কিন্তু অবশ্যই তাঁরা জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটা দেখেননি যা আমরা করছি।

রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানার এই খণ্ডগুলি সবসময় যে পরপর বাঁধানো থাকে, তা নয় এবং আমরা একটি ৩এ নামক অতিরিক্ত খণ্ড থেকেও ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই থেকে ডিসেম্বর অবধি তথ্য পাই। এর ৩৯৯ পৃষ্ঠায় পাঁচজন গোমস্তাকে প্রদত্ত অগ্রিমের উল্লেখ আছে, যা ১৮ জুলাই, ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে রজার ড্রেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হওয়া

একটি মন্ত্রণাসভায় অনুমোদন পায়। হাতের লেখা খুব ভালোভাবে পড়া যায় না এবং বেশ আবছা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও গোমস্তাদের নামগুলি উদ্ধার করা যায়। সেগুলি হল—হরানন্দ পাল, মঙ্গলেন্দু ঠাকুর, হিরপেননান সরকার, সাউন সরকার এবং হরিঅনন্ত ঠাকুর। মনিখ ঠাকুর এবং একজন কোনো দত্ত তাঁদের জামিনদার ছিলেন। এই খণ্ডগুলিতে ধারাবাহিকভাবে লিখিত তথ্য থেকে আমরা গোমস্তাদের প্রদত্ত অগ্রিম টাকা সম্বন্ধে জানতে পারি, যাদের পদবিগুলি দেখে সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ বলেই মনে হয়। ৩১ জুলাই ১৭৫৩-তে হিসাবের খাতায় লিখিত গোমস্তাদের পদবিগুলি ছিল রায়, সেন, মুখার্জী, পাল, ঠাকুর, বক্সী এবং বোস। আবার, ৩১ অক্টোবর আমরা বাংলার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হিসাবের খাতায় ১৫ জন গোমস্তার নাম পাই, যারা হলেন ঘোষ, সরকার, ঠাকুর, বোস, দাস, পালিত, ঘোষাল, বিশ্বাস, সামন্ত এবং একজন জাফের[৪৩]।

১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই, আমরা গোমস্তা এবং অন্যান্য পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের একটি তালিকা পাই[৪৪]। আমরা পুনরায় একইরকম নিযুক্তির তালিকা পাই, যাতে কেবল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থরা রয়েছে। যাদের নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের বিবরণ, পদ, বেতন এবং জামিনের তথ্যগুলি হল—

১। রামচাঁদ মুখার্জী, গোমস্তা, ৩৪ টাকা, প্রতাপনারায়ণ চৌধুরী।

২। মনোহর মিত্র, নগদরক্ষক, ২২ টাকা, কানাই মিত্র।

৩। কিষেণ মজুমদার, করণিক, ১৫ টাকা, রামজীবন কবিরাজ।

৪। রঘু বসাক, করণিক, ১৫ টাকা, রামমোহন ঠাকুর।

৫। জগন্নাথ সেন, গোমস্তা, ২০ টাকা, নন্দকিশোর কবিরাজ।

৬। নীলাম্বর দাস, নগদরক্ষক, ২০ টাকা, রামজীবন কবিরাজ/রামরাম বোস।

৭। গদাধর বোস, করণিক, ২০ টাকা, শশীদাস সরকার।

৮। দুলাল দাস, করণিক, ১৫ টাকা, শ্যাম ঠাকুর।

৯। হিদারাম বোস, করণকি, ১৫ টাকা, বিনোদ মিত্র।

এমন আরও অনেক তথ্য খুঁজে বের করা যায়, যাতে প্রমাণিত হয় যে, নবনিযুক্ত গোমস্তা এবং স্বজাতীয় কর্মীরা যেমন করণিক এবং নগদরক্ষকরা প্রায় সবাই বাংলার ওই তিনটি উচ্চবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা আগেই বলেছি যে, আমরা যে প্রথম উদাহরণ পাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যখন এক নতুন শ্রেণির উদ্ভব হয়, যারা তীব্রভাবে শ্রেণিসচেতন ছিল। এই শ্রেণিটি একে অপরকে সমর্থনের এক অনন্য পদ্ধতি বের করে, যাতে এই তিনটি উচ্চবর্ণের মানুষ লাভবান হয় এবং পরবর্তী আড়াইশো বছরের জন্য বাংলার প্রভাবশালী সামাজিক শক্তি হিসেবে

একজোট হয়েছে। কিন্তু এরপরেও বলব, এর মানে এই নয় যে, জাতিগতভাবে বণিক সম্প্রদায়ের পতন ঘটেছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির হয়ে কাজ করেছে ও কলকাতায় বিপুল সম্পদের মালিকও হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের এই প্রশস্ত রাজপথটি উন্মুক্ত হওয়ার আগে এবং ইংরেজদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার উদ্দেশ্যে প্রথম লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য এবং সম্পদ আহরণ এবং তারপর শাসনকার্যে প্রবেশ করা। অমরা এর আগে মুসলমান অধ্যুষিত বাংলায় ১২০৪ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের শাসনকালের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এত বেশি করে নিযুক্ত হতে দেখেনি। উদাহরণস্বরূপ বাংলার সুলতানদের দ্বারা কিছু শিক্ষিত কায়স্থকে নিযুক্তির স্বল্প কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণদের খুব বেশি পাওয়া যায় না। আমরা অল্প কিছু উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুর জাহাঙ্গীর দ্বারা রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে নিযুক্তির কথা জানতে পারি, যাদের বলা হত জমিন্দার এবং রাজা। তাঁর শাসন বাংলার পূর্ব ভূখণ্ডে বেশ গভীরে প্রবেশ করে এবং তাঁর সুবেদারেরা কার্যকরীভাবেই শহরতলিগুলিকে পদানত করে রেখেছিল। আমরা দেখব কেমন করে বাংলার প্রথম নবাব, মুর্শিদকুলি খাঁ বেশ কিছু উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দু জমিদার নিয়োগের এক ইচ্ছাকৃত নীতি চালু করেন, যারা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিল, গোমস্তাদের মতো নয় এবং কী করে তিনি এই জমিদারদর জোটগুলিকে এক একটি বৃহৎ, আঁটোসাঁটো স্থানীয় বাহিনীতে পরিণত করলেন। রত্নলেখা রায় বলেছেন, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে কীভাবে বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা চোদ্দজন বড় জমিদার (রাজা) নিয়ন্ত্রণ করতেন। যাঁদের মধ্যে এগারো জন ছিলেন বাঙালি ব্রাহ্মণ, রাজপুত এবং কায়স্থ[৪৫]। ড. রায় গ্রামবাংলার ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের একটি শ্রেণির কথা বলেন, যারা ‘গৃহস্থ’ বা মানীগুণী লোক বলে পরিচিত ছিল, যারা তাদের নিজেদের পরিবেশে যতই বিনয়ী হোক না কেন, লাঙল ধরাটাকে সম্মানের হানি বলে গণ্য করত[৪৬]। ‘ভদ্রলোক’-দের এই আদিরূপ নবাবের শাসনকালে আলাদাভাবে পদমর্যাদা লাভ করেছিল এবং মুসলমান ভদ্র সম্প্রদায়, অর্থাৎ আশরাফ, কাজী, মৌলবি, খোন্দকার ইত্যাদিদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়েছিল।

এবারে দেখা যাক, ওরা কীভাবে কাজ করত। এন কে সিনহা গোমস্তাদের নিযুক্তির বিষয়ে যে তথ্য দিয়েছে তা এমন—ওদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য (কোম্পানির চাকুরেদের) কোম্পানির নিজস্ব বিনিয়োগের সঙ্গে আরও বেশি ফলপ্রসূভাবে মেলাতে সক্ষম করে তুলতে হবে ... (যাতে গোমস্তারা) এই বাণিজ্য আগের চেয়ে অনেক বেশি সুদূরপ্রসারিত করতে পারে।[৪৭] ড. সিনহা এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছিল *দস্তক*-এর অপব্যবহারের মাধ্যমে।

আর এটাই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা এবং ইংরেজদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণ, যার থেকে সিরাজের কলকাতা দখল এবং পরে পলাশির যুদ্ধ হয়। টলবয়েজ হুইলারও পলাশির যুদ্ধকে পরোক্ষভাবে গোমস্তা নিযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করেছেন, যার মানে দাঁড়াচ্ছে যে, উমিচাঁদের মতো বেনিয়ান তাঁর ব্যবসার লাভজনক একটি শাখা হারান এবং যারপরনাই বিরক্ত হন[৪৮]। তিনি দাবি করেন এই ঘটনা নবাব এবং ইংরেজদের মধ্যে গোলমালে প্ররোচনা দিয়েছিল এবং তারই ফল হল পলাশির যুদ্ধ।

নতুন গোমস্তা ব্যবস্থার ফলাফল হিসেবে শীঘ্রই যা দেখা গেল, তা হচ্ছে সুযোগের যথেষ্ট অপব্যবহার এবং গোমস্তা এবং তাদের প্রভুদের বেআইনি পথে সম্পদ বৃদ্ধি। বাংলাদেশী ঐতিহাসিক মুইন-উদ-দিন আহমেদ খান বলেছেন যে, ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের একটি বিশেষ রিপোর্ট বলছে যে, পুরো দেশটা গোমস্তাদের দ্বারা পদদলিত হচ্ছে, যারা বাজারের ওপর একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করেছে, জনগণকে ঠেঙিয়ে কয়েদখানায় যেতে বাধ্য করছে এবং চড়া দরে ওদের মাল কিনতে বাধ্য করছে, স্থানীয় মাল কম দামে কিনছে, মূল উৎপাদকদের ক্ষতিকর শর্তেও দাদনী বা অগ্রিম নিতে বল প্রয়োগ করছে, জজসাহেবের মতো ঝগড়ার মধ্যস্থতা করছে এবং আরও অনেক নিপীড়নমূলক কুকর্ম করছে[৪৯]। এর আগে মজহারুল হকও বলেছেন যে, মালদহে কোম্পানির রেসিডেন্ট ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে গোমস্তাদের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে: একদল বদমায়েশ ... যারা দেশের রাজা হয়ে বসেছে, দাঙ্গা বাধাচ্ছে, বণিকদের জেলে পুরছে, চরম ঔদ্ধত্য নিয়ে লিখছে এবং কথা বলছে[৫০]। হক ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে কাশিমবাজারে কোম্পানির প্রধানের সরকারের উদ্দেশ্যে লেখা একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছেন, যে সারা দেশ জুড়ে গোমস্তাদের গুরুতর বাড়াবাড়ি নিয়ে আশ্চর্যজনক সংখ্যায় নালিশ আসছে[৫১]। শুভ্রা চক্রবর্তী বলেছেন কীভাবে সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৬৮ এবং ১৮৭৪-এর ভেতর গোমস্তাদের নিষ্ক্রিয় করে কিছুদিনের জন্যে আবার দাদনী বণিকদের পুনর্নিযুক্ত করা হয়[৫২]। ড. এন কে সিনহা একই কথা বলেছিলেন যে, কীভাবে বেনিয়ান এবং গোমস্তারা বণিক এবং দোকানদারদের বাধ্য করত বাজারদরের চেয়ে ৩০, ৪০ অথবা ৫০ শতাংশ বেশি দামে মাল কিনতে[৫৩]। ড. সিনহা কোম্পানির কর্মচারীদের দ্বারা ব্যবহৃত পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন, যারা তাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ স্বদেশে প্রেরণ করত। আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে, বাংলা ধ্বংসের জন্য ঔপনিবেশিক শক্তি গোমস্তাদের কাজে লাগায় এবং তারা প্রায় সকলেই বাংলার এই তিনটি উচ্চবর্ণভুক্ত ছিল। তবে ওই তিন উচ্চশ্রেণির অপেক্ষাকৃত দরিদ্র সদস্যরা কেমন আচরণ করত তার বিবরণ অমিল।

আমরা জানি কী করে এই নতুন শ্রেণি, যারা মুনশি বা বেনিয়ান হিসেবে ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন কর্তাদের হয়ে কলকাতায় কাজ করত, তাদের বিপুল সম্পদ অর্জন করেছিল। আর করেছিল বেশ খোলাখুলিভাবেই। ড. ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন যে, ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে নবকৃষ্ণ দেবের খাতায় কলমে মাইনে ছিল মাত্র ৬০ টাকা। কিন্তু তিনি তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। যখন তাঁকে 'রাজা' পদে তুলে দেওয়া হল, তাঁর মাইনে হল ২০০০ টাকা। উনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং মাত্র ২০০ টাকা নিতে সম্মত হলেন[৫৪]। অবশ্যই এর কারণ ছিল যে, তাঁর ধনসম্পত্তির উৎস ছিল অন্যান্য বেআইনি রোজগার। এই ভদ্রলোক গোষ্ঠীটিই জমিদারি এবং জমির বিলিব্যবস্থার সময় যখন নীলাম ডাকা হয়, তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তার সঙ্গে সঙ্গে মহাজনী এবং অন্যান্য ব্যবসাও ছিল। জমি কেনা ছিল সবচাইতে নিরাপদ বিনিয়োগ। রজত দত্ত বলছেন[৫৫], অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, প্রায় সমস্ত জমিদারই ছিল কায়স্থ, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়। এরা সেই গোষ্ঠী, যারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির শুধুমাত্র শক্তিমান অথচ বিবেকবর্জিত গোমস্তা, মুনশি, দেওয়ানই নয়, এরা অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে জমিতে বিনিয়োগ করেছে, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়া অবধি ইংরেজি শিক্ষার ওপর একচ্ছত্র অধিকার কায়েম রেখেছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও এদের প্রবল উপস্থিতি দেখা গেছে এবং পরবর্তীকালে আইন এবং ডাক্তারিতেও দেখা গেছে, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, এটিই সেই সামাজিক গোষ্ঠী, যারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং প্রচুর ভুগেওছে, যদিও শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অন্তও ঘটিয়েছে। উপসংহারে বলতে পারি যে, ১৭৫৩ এবং ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাবলি যে নতুন অর্থব্যবস্থার সূচনা ঘটায়, তারই ফলে এক নতুন শ্রেণির জন্ম হয়, যার প্রমাণ লিখিতভাবে পাওয়া যায়। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের নথি পাওয়া একটি দুর্লভ ঘটনা বটে, যা সামাজিক ইতিহাসের একটি দিক পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে, যা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্যের পাহাড়ে বরফচাপা হয়ে পড়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। আমরা সুমিত সরকারের দু-দশকেরও বেশি আগের একটি পর্যবেক্ষণ দিয়ে শেষ করব, সেটি হল, এক ধরনের সামাজিক ইতিহাস জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যারা 'হিন্দু' পিরিয়ডের ওপর কাজ করছেন, কিন্তু তা 'মুসলিম' বা 'ব্রিটিশ' শতকে। প্রাচীন ভারতের ইতহিাস পড়তে গেলে জাতপাতের বিষয়টি বাদ দেওয়া যাবে না কোনোমতেই। কিন্তু মাত্র কিছুদিন আগে ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাসের কাজে জাতের গুরুত্ব বৃদ্ধির সূচনা করেছে।[৫৬]

তথ্যসূত্র

১। J.H. Broomfield, *Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth Century Bengal*, University of California Press, 1968, p. 6.

২। S.N. Mukherjee, *Calcutta: Myths and History*, Calcutta, 1977, p. 30.

৩। *Ibid*, p. 31.

৪। Richard P. Cronin, 'The Government of Eastern Bengal and Assam and Class Rule in Eastern Bengal' in J.R. McLane ed., *Bengal in the Nineteenth and Twentieth Century*, Michigan State University, 1975, pp. 99-100.

৫। J.H. Broomfield, 'The Frustration of the *Bhadralok*: Pre-Independence Politics in Bengal' in *Journal of South Asian Studies*, Vol. 39, No. 1, p. 218.

৬। Parimal Ghosh, *What Happened to the Bhandralok*, New Delhi, 2016, p. 218.

৭। J.H. Broomfield, *Elite Conflict* ..., pp. 6-10.

৮। Tithi Bhattacharyya, *Sentinels of Culture: Class, Education and the Colonial Intellectual in Bengal (1848-1885)*, New Delhi, 2005, p. 2.

৯। *Ibid*, pp. 35-7.

১০। Sumit Sarkar, *Writing Social History*, New Delhi, 1997, pp. 176-77.

১১। *Ibid*, p. 20.

১২। S.N. Mukherjee, *op.cit.*, pp. 18-9.

১৩। *Ibid*, pp. 29 ff.

১৪। H.H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1891, Vol. I, p. 48.

১৫। K.S. Sinha, *The People of India, West Bengal*, The Anthropological Survey of India, Vol. 43, Pt. 1, p. 640.

১৬। H.H. Risley, *op.cit.*, p. 440.

১৭। Hitesranjan Sanyal, *Social Mobility in Bengal*, Kolkata 1981, p. 19.

১৮। *Ibid*, p. 20.

১৯। *Ibid*, p. 21.

২০। *Ibid*.S.N. Mukherjee, *op.cit.*, p. 29.

২১। Sukumar Sen, *History of Bengali Literature*, New Delhi, 1960, p. 107 ff.

২২। Dinesh Chandra Sen, *Chaitanya and his Companions*, University of Calcutta, 1917, p. 100 ff.

২৩। Sukumar Sen, *op.cit.*, p. 112 ff.

২৪। Narendra Krishna Sinha, *Economic History of Bengal from Plassey to the Permanent Settlement*, Calcutta, 1956, Vol. I, p. 6.

২৫। *Ibid.*

২৬। S.N. Mukherjee, *op.cit.*, p. 13.

২৭। *Ibid*, p. 23.

২৮। Shubhra Chakrabarty, 'Collaboration and Resistance: Bengal Merchants and the East India Company, 1757-1833' in *Studies in History*, Vol. 10, No. 1, p. 107.

২৯। P.J. Marshall, 'Private British Investment in Eighteenth Century Bengal' in *Bengal Past and Present*, Diamond Jubilee Number, p. 55.

৩০। Narendra Krishna Sinha, 'Indian Provinces Enterprise: Its Failure in Calcutta (1800-1848)' in *Bengal Past and Present*, p. 115.

৩১। S.N. Mukherjee, *op.cit.*, p. 14.

৩২। National Archives of India, New Delhi, *Bengal Public Consultations*, 2 February 1707.

৩৩। Narendra Krishna Sinha, *Economic History of Bengal...*, p. 7.

৩৪। K.K. Datta, *Economic Condition of the Bengal Subah: In the Years of Transition, 1740-1722*, Calcutta, 1984, p. 85.

৩৫। National Archives of India, *Home (Public) Proceedings, 1753*, Vol. I, II.

৩৬। K.K. Datta, *Indian Records Series, Fort William-India House Correspondence*, National Archives of India, New Delhi, 1958, Vol. I, p. 684.

৩৭। *Ibid*, p. 290.

৩৮। *Ibid*, p. 293.

৩৯। National Archives of India, *Home (Public) Proceedings*, Vol. I, pp. 327-28.

৪০। *Ibid.*

৪১। *Ibid*, p. 320.

৪২। *Ibid*, p. 336.

৪৩। *Ibid*, Vol. IIIA, p. 666.

৪৪। *Ibid*, Vol. I, pp. 365-366.

৪৫। Ratnalekha Ray, *Changes in Bengal Agrarian Society*, New Delhi, 1979, pp. 26-9.

৪৬। *Ibid*, p. 30.

৪৭। Narendra Krishna Sinha ed., *The History of Bengal (1707-1905)*, University of Calcutta, Calcutta, 1967, p. 9.

৪৮। *Ibid*, p. 225.

৪৯। Muin-ud-din Ahmad Khan, *Social History of the Muslims of Bangladesh under the British Rule*, Dhaka, 1992, p. 52.

৫০। Mazharul Haq, *The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, 1698-1784*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1964, p. 229.

৫১। *Ibid*, p. 227.

৫২। Subhra Chakrabarti, 'Collaboration ...', pp. 112-13.

৫৩। Narendra Krishna Sinha, *Economic History...*, p. 12.

৫৪। Tithi Bhattacharya, *op.cit.*, p. 46

৫৫। Rajat Dutta, *Society, Economy and the Market: Commercialisation in Rural Bengal c. 1760-1800*, New Delhi 2000, p. 135.

৫৬। Sumit Sarkar, *op.cit.*, p. 38.